# কোরাম ছাড়াই অধিবেশন

## ■ সংসদীয় কমিটি নেই
## ■ বিরোধীদল অনুপস্থিত

লিখেছেন **অনিরুদ্ধ ইসলাম**

বাংলাদেশের সংসদ ও সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাস কখনই সুখের নয়। এক ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে যাত্রা শুরুতে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করা হলেও মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় বাকশালীয় একদলীয় ব্যবস্থার কোপে ঐ সংসদীয় ব্যবস্থার অবসান ঘটানো হয়েছিল। জাতীয় সংসদকে পরিণত করা হয়েছিল একটি রাবার স্ট্যাম্পে। তারপর দীর্ঘদিন পার হয়েছে। বাকশাল একদলীয় ব্যবস্থা পরিবর্তন করে বহুদলীয় ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। কিন্তু সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন ঘটেনি। সংসদও তার সার্বভৌম মর্যাদা ফিরে পায়নি। সামরিক স্বৈরাচারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দীর্ঘ দেড় দশকের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন ঘটে। সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় সংসদ তার মর্যাদা ফিরে পেয়েছে। এর জন্য রক্ত, ঘাম, পরিশ্রম, বিনিদ্র রজনী যাপন কম হয়নি। দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামের ফলশ্রুতি ছিল এই সংসদ ও সংসদীয় গণতন্ত্র। কিন্তু সেই সংসদ আর সংসদীয় ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা দেখে মানুষ আর আস্থা রাখতে পারছে না। কেবল বাইরের মানুষ নয়, সংসদের অভ্যন্তর থেকে প্রশ্ন উঠছে– 'সংসদে হচ্ছেটা কি?'

গত তেসরা মার্চ সংসদে স্পিকারের বিরুদ্ধে বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে বিএনপি জোট সরকারের মন্ত্রী ও শরিক দল জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্যরা যখন এমন অনির্ধারিত বিতর্কে মেতে ওঠেন তখন ঐ মন্ত্রিসভার আরেক সদস্য তার বিরক্তি গোপন করতে না পেরে 'সংসদে হচ্ছেটা কি' বলে চিৎকার করে ওঠেন। তার ঐ চিৎকার শুধু চিৎকার ছিল না, এটা ছিল দেশের মানুষের প্রশ্ন। মাত্র পাঁচ মাস আগে রেকর্ড সংখ্যক ভোটাররা শান্তিপূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়ে যে সংসদ নির্বাচিত করলেন সেই সংসদ কেবল চলছে না তাই নয়, সেই সংসদ নিয়ে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহ, সরকার, স্পিকার, সংসদ সদস্যদের কোনো ভাবনা আছে কিনা এ নিয়ে দেশবাসী সন্দিহান হয়ে পড়েছে। শুরুতেই এবার অষ্টম জাতীয় সংসদ প্রধান বিরোধী দলহীন অবস্থায় এক পায়ে যাত্রা শুরু করেছে। সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনেও সেই অবস্থার এখনও কোনো পরিবর্তন হয়নি। আর বিরোধীদলবিহীন অবস্থায় যে সংসদ চলছে সেখানে ক্ষমতাসীন দলের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার পরও কোরাম হয় না। আর সংসদের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয় 'পয়েন্ট অব অর্ডারের' নামে মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের অনাবশ্যক বিতর্কে। আর স্তাবকতা-চাটুকারিতার প্রতিযোগিতা তো রয়েছেই।

বস্তুত, বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র দ্বিতীয় দশকে প্রবেশ করলেও এই পুরো সময়টাই ছিল কার্যত সংসদহীন সংসদীয় গণতন্ত্রের কাল। একানব্বইয়ের নির্বাচনের পর প্রথম দু'বছর সংসদ মোটামুটি ঠিকভাবেই চলেছিল। পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রধান অর্জন ছিল সংসদীয় ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন। পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের মাত্র চার মাস সময়ের মধ্যে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সমস্ত দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীতে সংসদীয় গণতন্ত্রে এই প্রত্যাবর্তন ঘটে। কিন্তু এখানেও বাঙালি মানসের সেই কথাই প্রমাণিত হয়েছে 'আমরা যা বলি তা করি না। যা করি তা বিশ্বাস করি না।'

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ঐতিহাসিক দ্বাদশ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে দেশে সংসদীয় ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন ঘটালেও কার্যক্ষেত্রে বস্তুত স্বৈরাচারী ব্যবস্থার ধারাবাহিকতাই বজায় রাখা হয়। সংসদীয় ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ সার্বভৌম। সরকার জাতীয় সংসদের অধীন। কিন্তু প্রয়োজনে দেখা গেল জাতীয় সংসদই সরকারের অধীন। জাতীয় সংসদ নয়, প্রধানমন্ত্রী এখানে সার্বভৌম। সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে দেশে যে প্রধানমন্ত্রীর শাসন ব্যবস্থাই কায়েম হয়েছে তিনটি সংসদের অভিজ্ঞতা সেটাই প্রমাণ করে।

আর সে কারণেই দেশের সরকার বিরোধী লক্ষ্যবস্তু হয়েছে জাতীয় সংসদ। পঞ্চম সংসদ প্রতিষ্ঠার আড়াই বছরের মাথায় প্রথমে সংসদ বর্জন ও পরে সংসদ থেকে বিরোধীদলের সদস্যদের পদত্যাগের ঘটনা ঘটে। এর ফলে বাকি পুরো সময়টা জুড়ে পঞ্চম জাতীয় সংসদ একদলীয় সংসদে পরিণত হয়েছিল।

আর ষষ্ঠ সংসদ তো ছিল একটি ক্যারিকেচার। ভোটারহীন ভোটে নির্বাচিত ঐ সংসদ একটি অধিবেশনও পার করতে পারেনি। জনগণের প্রতিরোধের মুখে নিজেই নিজের অস্তিত্বের বিলোপ ঘোষণা করেছে। অবশ্য যাবার আগে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা সংবলিত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পাস করে গেছে ঐ সংসদ। তবে ঐ সংশোধনী পাস করতে তারা কতখানি মনোযোগী ছিল সংবিধানের ঐ ত্রয়োদশ সংশোধনীর বাস্তব প্রয়োগ করতে গিয়ে সেই প্রশ্ন উঠেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টার ক্ষমতা, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতার পরিধি– এসব নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করেছে।

ত্রয়োদশ সংশোধনীর ব্যবস্থায় একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জাতীয় সংসদের সপ্তম সংসদ প্রতিষ্ঠা হলেও এবার বিরোধীদলে আসীন পুরাতন ক্ষমতাসীনরা ঐ সংসদকে মেনে নেয়নি। নিজ দলীয় স্পিকার ঐ সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু না করতেই এবারের প্রধান বিরোধীদল ওয়াকআউট করে বেরিয়ে যায়। এই ওয়াকআউট আর বর্জনের পালা বেশ কিছুদিন চলে ঠিকই। কিন্তু তারপর টানা বর্জনের মাঝে একদিন উপস্থিত হয়ে সংসদ সদস্যপদ টিকিয়ে রাখার অনৈতিক কাজ ছাড়া সপ্তম জাতীয় সংসদ প্রধান বিরোধীদলের সদস্যদের আর সংসদে দেখেনি।

এই সপ্তম সংসদেই সংসদ সদস্যদের বিতর্কের মান এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সেই সময়ের রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন পর্যন্ত সংসদ সম্পর্কে কটু মন্তব্য করতে বাধ্য হন। সংসদে অশ্লীলতার প্রতিযোগিতায় বিরক্ত সাধারণ মানুষ ছেলে-মেয়েদের তার হাত থেকে বাঁচাতে রেডিও-টেলিভিশনে সংসদ অধিবেশন প্রচার না করারও দাবি জানান।

সপ্তম জাতীয় সংসদ অবশ্য তার পাঁচ বছরের নির্দিষ্ট মেয়াদ পূরণ করেছে। এ নিয়ে সে সময়ের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের গর্বের অন্ত নেই। অবশ্য পঞ্চম সংসদও তার মেয়াদ পূরণের মাত্র পাঁচ মাস আগে তৎকালীন ক্ষমতাসীন বিএনপির সংকট মোকাবেলায় পদক্ষেপ থেকে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সপ্তম জাতীয় সংসদ ঐ মেয়াদ পূরণের রেকর্ড সৃষ্টি করলেও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেকে প্রমাণিত করতে পারেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক সপ্তম জাতীয় সংসদের ওপর গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, ঐ সংসদে একজন সদস্য তিন মিনিট বক্তৃতা করলে তার দেড় মিনিট ব্যয় করেন সংসদ নেত্রীর প্রশংসা করে। এক মিনিট ব্যয় করেন বিরোধী নেত্রীর কুৎসা গাইতে। আর বাকি আধা মিনিট নিজের কথা বলেছেন। সংসদে প্রতি এক ঘন্টায় মাত্র তিন মিনিট ব্যয় করা হয় দরিদ্র ইস্যুতে। অথচ দেশের ভোটারদের শতকরা আশি ভাগই দরিদ্র।

সপ্তম সংসদ তাই-নাই করে মেয়াদ পার করে দিতে পারলেও অষ্টম জাতীয় সংসদ প্রথম দিন থেকেই এক পায়ে চলছে। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পরাজিত আওয়ামী লীগ নির্বাচনে 'স্থূল কারচুপির' অভিযোগ তুলে প্রথমে শপথ নিতেই অস্বীকার করে। আওয়ামী লীগ দলীয় পূর্বতন স্পিকার বিজয়ী দলের প্রার্থীদের শপথ দেয়াতেও টালবাহানা করেন। শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা শপথ নিলেও এখন পর্যন্ত সংসদ অধিবেশনে যোগ দেননি, যোগ দেবেন কিনা সে প্রশ্নটাও অনিশ্চিত।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মনস্থির না করতে পারায় এখনও কেউ সংসদ উপনেতা হননি। ফলে প্রধানমন্ত্রী বিদেশ গেলে সংসদে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে কে কথা বলবেন সেটা স্থির নেই। এবারই প্রধানমন্ত্রী কমনওয়েলথ সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়ায় থাকায় ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরিস্থিতি সম্পর্কে সংসদে সরকারের পক্ষ থেকে কি বলা হবে, কে বলবেন তা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়

এই একপেয়ে সংসদই রাষ্ট্র ও রাজনীতি পরিচালনা করছে। অবশ্য আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশে যে ব্যবস্থা চালু আছে তা সংসদীয় ব্যবস্থা নয়, প্রধানমন্ত্রীর শাসন ব্যবস্থা। আর এ কারণেই প্রধানমন্ত্রী বাদে সংসদ প্রায় অস্তিত্বহীন। অষ্টম জাতীয় সংসদে বিএনপি জোট সরকারের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। জোট সরকারের মন্ত্রী-হুইপ মিলিয়ে সংখ্যা ষাটের ওপর। অথচ সংসদে কোরাম সংকট নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে কোরামের অভাবে স্পিকারকে অধিবেশন থামিয়ে দিতে হয়। কোরাম হবে না আশঙ্কায় বেল বাজিয়ে সদস্যদের ডাকতেও তিনি সাহস পাননি। আর গত ২ মার্চ ঈদের ছুটির বিরতির পর জাতীয় সংসদ অধিবেশনের শুরুর নির্ধারিত সময়ে মাত্র চারজন সাংসদ উপস্থিত ছিলেন। আধঘন্টা পর ৬০ জনের কোরাম পূরণ হলে সংসদ অধিবেশন শুরু হয়। কিন্তু তারপর সংসদ সদস্যদের অধিকাংশই বেরিয়ে যাওয়ায় অধিকাংশ সময়ই সংসদ অধিবেশন চলে কোরামহীনভাবে। শেষ পর্যন্ত একজন এ ব্যাপারে স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সংসদের বিভিন্ন জায়গা থেকে ডেকেডুকে এনে কোরাম পূরণ করে সংসদের অধিবেশন আবার চালু করা হয়।

কেবল কোরাম সংকট নয়, সংসদে চলছে নেতৃত্বের সংকটও। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীই সংসদ নেত্রী। ভারতেও তাই। সংসদ পরিচালনায় স্পিকার সার্বভৌম হলেও সংসদের কার্যাবলী পরিচালনায় স্পিকারকে তার পরামর্শই গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও সরকারি কাজের ব্যস্ততায় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সবসময় সংসদে উপস্থিত থাকা সম্ভব হয় না। সে কারণেই সংসদে একজন সংসদীয় উপনেতার বিধান রয়েছে। প্রতি সংসদের শুরুতেই এই উপনেতা নির্বাচনের কথা। কিন্তু নির্বাচনের পর পাঁচ মাস হয়ে গেলেও বিএনপি জোট তাদের কোনো সংসদীয় উপনেতা নির্বাচন করেনি। পত্রপত্রিকায় সংসদ উপনেতা হিসাবে বিভিন্ন জনের নাম শোনা যায়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মনস্থির না করতে পারায় এখনও কেউ সংসদ উপনেতা হননি। ফলে প্রধানমন্ত্রী বিদেশ গেলে সংসদে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে কে কথা বলবেন সেটা স্থির নেই। এবারই প্রধানমন্ত্রী কমনওয়েলথ সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়ায় থাকায় ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরিস্থিতি সম্পর্কে সংসদে সরকারের পক্ষ থেকে কি বলা হবে, কে বলবেন তা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়। সংসদে ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ে সংসদ সদস্যরা আলোচনার দাবি করলে প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা জানান, প্রধানমন্ত্রী ফিরে এলে সে বিষয়ে আলোচনা হবে। আবার পরদিনই সরকারের পক্ষ থেকে সিনিয়র মন্ত্রী সাইফুর রহমান বিবৃতি প্রদান করেন। অথচ একজন উপনেতা থাকলেই এ নিয়ে কোনো সমস্যা সংশয় সৃষ্টি হতো না। প্রধানমন্ত্রী বিদেশে গেলে কার কাছে সরকারের দায়িত্ব দিয়ে যাবেন সে নিয়ে সংবিধানেও কিছু লেখা নেই। এ বিষয়ে কিছু লেখা হোক সেটাও দুই নেত্রী পছন্দ করেন না। এ কারণেই মেয়ের বাচ্চা হবার নাম করে পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাসাধিককালের ওপর যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে তার সমস্ত দপ্তরই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর বেগম খালেদা জিয়া সরকারই নয়, সংসদও যেন তার সঙ্গে নিয়ে যান। সে কারণেই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় আন্তর্জাতিক প্রশ্নে সংসদে সরকারের বিবৃতির জন্য প্রধানমন্ত্রীর

ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলা হয়। ভারতের দাঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার প্রশ্নে সাইফুর রহমানকে দিয়ে শেষ পর্যন্ত সামাল দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সেটাও ধোপে টেকেনি। সরকারের অন্য সিনিয়র মন্ত্রীরাই অর্থমন্ত্রীর ঐ বিবৃতি নিয়ে বিধিগত প্রশ্ন তুলে স্পিকারের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন।

এ ঘটনাই ঘটেছে সম্প্রতি সংসদে। স্পিকার সংসদের বিধি লংঘন করে প্রশ্নোত্তর পর্বে অর্থমন্ত্রীকে বিবৃতি দিতে দিয়েছেন। আর অন্য দুই মন্ত্রী সে নিয়ে বিতর্ক তুলেছেন। সংসদের চীফ হুইপ একেবারে নিশ্চুপ ছিলেন। আর এই সুযোগ নিয়েই জোট সরকারের শরিক জামায়াতে ইসলামীর সদস্যরা ভারতের দাঙ্গা প্রসঙ্গে সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া বিবৃতি এক্সপাঞ্জ করার দাবি করেছেন। অবশ্য তাদের ঐ দাবি যতখানি বিধিগত তার চাইতে ঐ বিবৃতিতে দাঙ্গায় নিহতদের 'মুসলমান' না বলে 'মানুষ' বলে উল্লেখ করার কারণে।

বস্তুত, অষ্টম জাতীয় সংসদে কোনো বিধি না মানাটাই বিধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পয়েন্ট অব অর্ডারের নামে যে কোনো সদস্য দাঁড়িয়ে যা খুশি বলেন। স্পিকার তাতে বাধা দেন না। এ নিয়ে কেবল অনাবশ্যক সময়ই ব্যয় হয় না, এ সময় পয়েন্ট অব অর্ডারে যে চাটুকারিতা করা হয় তা যেকোনো হিসাবের বাইরে। প্রধানমন্ত্রী তো বটেই, প্রধানমন্ত্রীর পুত্রকেও চাটুকারিতায় ভিজিয়ে দেয়া হয়।

জাতীয় সংসদের স্পিকার অবশ্য বলেছেন, প্রথম অধিবেশনে তিনি এই সুযোগ দিয়েছিলেন সংসদ সদস্যরা যাতে কথা বলার সাহস অর্জন করেন সে কারণে। কিন্তু এখন তারা এতই সাহসী হয়েছেন যে, স্পিকারের কথাও শুনছেন না। স্পিকার তাই বাধ্য হচ্ছেন মাইক বন্ধ করে দিতে। আর এ কারণে মাইক ছাড়া চিৎকারই হচ্ছে না, বিরোধীদলের (?) একক সদস্য বলে দাবিদার কাদের সিদ্দিকী তাকে মাইক না দেয়ায় সংসদ থেকে ওয়াকআউট পর্যন্ত করেছেন।

সংসদের আলোচনা কেবল নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও সংসদ চলছে না। সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হলেও এ যাবৎ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠন করা হয়নি। এই কমিটির মাধ্যমেই সংসদ মন্ত্রণালয়ের কাজকর্মের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। জানা গেছে, এসব কমিটির সভাপতি কে হবেন সে নিয়ে বিএনপি সংসদ সদস্যদের মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা চলছে। এসব সভাপতি পদে বিরোধীদল কতভাগ পাবে তা নিয়েও সমস্যা রয়েছে। বিরোধীদল আওয়ামী লীগ স্থায়ী কমিটির দশজন সভাপতি চেয়েছে। বিএনপি বলছে, গত সংসদে তাদের বিপুল সংখ্যা থাকার পরও আওয়ামী লীগ তাদের স্থায়ী কমিটির কোনো সভাপতি পদ দিতে রাজি হয়নি। তাছাড়া গত সংসদেও সংসদীয় কমিটি করতে দেড় বছর লেগেছিল। অথচ এই সংসদীয় কমিটিকেই উভয় দল সংসদীয় ব্যবস্থায় জবাবদিহিতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মনে করে। সেই সংসদীয় কমিটিকে অকার্যকর রেখে সংসদ যে কার্যকরহীন হয়ে পড়ে সে দিকে তাদের মনোনিবেশ নেই।

সংসদের কাজে মনোনিবেশ না থাকলেও সংসদ সদস্য হিসেবে অধিকারের ব্যাপারে সংসদ সদস্যরা খুবই তৎপর। সংসদে শপথ গ্রহণ করার আগেই সংসদ হোস্টেলের স্যুইট নিয়ে কাড়াকাড়ি ন্যক্কারজনক পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এখন খোদ ডেপুটি স্পিকার ন্যাম সম্মেলনের জন্য নির্মিত ফ্ল্যাটগুলো সংসদ সদস্যদের দিয়ে দেয়ার আবদার করেছেন। সংসদের গাড়ি ব্যবহার নিয়ে পরিবহন বিভাগ খুবই নাজেহাল অবস্থায় রয়েছে।

> অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পরাজিত আওয়ামী লীগ নির্বাচনে 'স্থূল কারচুপির' অভিযোগ তুলে প্রথমে শপথ নিতেই অস্বীকার করে। আওয়ামী লীগ দলীয় পূর্বতন স্পিকার বিজয়ী দলের প্রার্থীদের শপথ দেয়াতেও টালবাহানা করেন। শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা শপথ নিলেও এখন পর্যন্ত সংসদ অধিবেশনে যোগ দেননি, যোগ দেবেন কিনা সে প্রশ্নটাও অনিশ্চিত

সংসদের এই হাল অবস্থার কারণ বর্তমান সংসদ ও সংসদ সদস্যদের বৈশিষ্ট্যই নিহিত রয়েছে। এর পূর্বে রাজনৈতিক কর্মীরাই সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হতেন। দেশের রাজনীতি, শাসন ব্যবস্থা উন্নয়নের ব্যাপারে তাই তাদের আগ্রহ ছিল। জনগণের মধ্যে কাজের ভিত্তিতে এই পর্যায়ে আসায় জনগণের প্রতিও তাদের দায়বদ্ধতা ছিল। বর্তমান সংসদের অধিকাংশই এখন শিল্প-ব্যবসার জগৎ থেকে আসা। এই সদস্যদের একটা বড় অংশের কোনো রাজনৈতিক ক্রিয়াকান্ডের ঐতিহ্য-অভিজ্ঞতা কোনোটাই নেই। নির্বাচনের মনোনয়ন, নির্বাচনে জেতা– সবটাই টাকা দিয়ে। সুতরাং সংসদের প্রতি দায়বদ্ধতা নয়, সংসদ সদস্য হিসেবে পরিচিতি তাদের জন্য যথেষ্ট এবং একটা বড় অংশের জন্য ব্যবসায়িক পুঁজি। সে কারণেই সংসদ অধিবেশনে যাওয়ায় তাদের কোনো আগ্রহ নেই। কোরাম পূরণ হবে কিভাবে? সংসদের আলোচনাতেও তাদের অংশগ্রহণ নেই।

অন্যদিকে সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন ও সংসদকে সার্বভৌম বলে দাবি করলেও পরপর তিনটি সংসদে সরকার ও বিরোধীদলে যে প্রধান দুটি দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি রয়েছে তারা এই সংসদীয় ব্যবস্থাকে দলনেত্রীর প্রধানমন্ত্রী পদের বৈধতাদানের প্রতিষ্ঠান বলে মনে করে মাত্র। সরকার গঠন ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি-

নির্ধারণ, আইন প্রণয়ন, সরকারের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা আদায়ে সংসদের কোনো ভূমিকা আছে বলে তারা মনে করে না। এক্ষেত্রে অবশ্য আওয়ামী লীগ বিএনপি'র তুলনায় অনেক সংসদমুখী। কিন্তু সেটাও বক্তৃতার জন্য। সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদের যথোপযুক্ত ভূমিকার ব্যাপারে তাদেরও কোনো মাথাব্যথা ছিল না, এখনও নেই।

এ কারণেই তিনটি নির্বাচনে জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভোট প্রদানের মাধ্যমে তিনটি সংসদ উপহার দিলেও, বাংলাদেশের সংসদ জনগণের কাছে ক্রমাগত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। সংসদ থাকছে ঠিকই। সংসদীয় গণতন্ত্রও চালু আছে। কিন্তু প্রাণহীন অবয়বহীন সংসদ সংসদীয় গণতন্ত্রকেই অর্থহীন করে তুলেছে। এ বিষয়টি যদি এখনই নজরে আনা না হয়, তাহলে দেশের জনগণের মধ্যে যে অনাস্থাবোধের জন্ম হবে তার ফাঁক গলে কোনো অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চেপে বসলে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না।